ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1272-1282
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.347

সুদক্ষিণা সেনের ‘জীবনস্মৃতি’: আধুনিক ভারতের সমাজ ইতিহাসের এক নারী কণ্ঠ

সৈকত পাত্র, *স্বাধীন গবেষক, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

An autobiography is a work in which a person expresses the experiences, feelings, and thoughts of their life in their own words. Sudakshina Sen was an educated and cultured woman of the nineteenth century. In her autobiography ‘JivanSmriti’, she described not only her personal life but also the social system of her time.

She wrote about her family environment, social customs, religious beliefs, and various superstitions present in Hindu society during that period. Her writings clearly show the position of women, the limitations on their education, and the conservative attitude of society toward women. The influence of Brahmanical traditions and the ideas of social reform are also reflected in her work.

In this autobiography, Sudakshina Sen attempts to understand society and history from a woman’s perspective. she also highlighted the social changes of her time, the spread of education, and the awakening of women. She mentioned several important social reformers, such as Keshav Chandra Sen, Vijaykrishna Goswami, and Bidhan Roy, whose ideas help us understand the intellectual climate of that period.

‘JivanSmriti’ is not merely a personal life story; it is an important document for understanding nineteenth-century society and history. Through the autobiography of a woman, we can see a realistic picture of the social conditions of that time. In this article, based on Sudakshina Sen’s autobiography ‘JivanSmriti’, I have tried to explore the nature of nineteenth-century Indian society, the challenges faced by women, and the issues related to women’s awakening.

Keywords: Autobiography, Autogynography, Fasting Festivals (vrat utsav), Antahpur (inner quarters), Brahmo Movement, Paganism

আত্মজীবনী (Autobiography) হল একজন ব্যক্তির স্বরচিত আত্মকথা। নারীবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মজীবনীর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। নারী আত্মজীবনী কেন লেখা হয়? কারন আত্মজীবনীর মাধ্যমে মেয়েদের জীবনের ইতিহাস ধরা পড়ে। তার মূল কারণ হচ্ছে মেয়েদের জীবনচর্চা বা জীবনবোধ প্রচলিত ঐতিহাসিক তথ্যে সেভাবে ধরা পড়ে না। আত্মজীবনীমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য হল- (১) ব্যক্তি জীবনের উন্মোচন অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনকে তুলে ধরা এবং (২) যিনি লিখছেন তার ব্যক্তি সত্তার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক প্রেক্ষিতের একটি পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন।

আত্মজীবনীমূলক লেখাতে বহির্জগতে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতি একজন ব্যক্তি কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে সেটাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয়। মেয়েদের লেখা ও পুরুষের লেখা জীবনের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। মেয়েদের লেখার ভঙ্গি পুরুষের থেকে ভিন্ন হয়। প্রখ্যাত মার্কিন লেখিকা Domna C. Stanton রচিত *The Female Autobiography: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century* গ্রন্থে, মেয়েদের আত্মকথার জন্য তিনি তৈরি করেছেন একটি নতুন শব্দ- 'অটোবায়োগ্রাফি'-র বদলে 'অটোগাইনোগ্রাফি'।[১] কিন্তু কেন? এর পেছনে কতগুলি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (১) ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি ঝোঁক এবং (২) বহির্জগতের তুলনায় পারিবারিক জীবনে বেশি আগ্রহ, (৩) কালানুক্রম না মেনে এলোমেলো লেখা।

Malavika Karlekar তাঁর *Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women* গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সময় মেয়েরা যে ঘরের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত পরিসর তৈরি করেছিলেন, তার প্রতিফলন ঘটেছিল আত্মজীবনীতে। ১৮৫০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে কবিতা, উপন্যাস, আত্মজীবনী মিলিয়ে বাংলাদেশে মেয়েদের রচিত অন্তত ৪০০-এর বেশি সাহিত্যকর্ম ও তাদের সম্পাদিত ২১ টি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম যুগের শিক্ষিত বাঙালি মহিলা যারা আত্মজীবনী লিখেছেন রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৮৯৯), সারদা সুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী মিত্র (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬) এই চারজনকে বলা হয় মেয়েদের প্রথম প্রজন্ম। যাঁরা প্রথম আত্মজীবনী লিখেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের আত্মজীবনী লেখিকারা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এনারা হলেন জ্ঞানোদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬-১৯২০), লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪), সারোদা মঞ্জুরী দত্ত (১৮৭২-১৯৫৪)।

বিংশ শতকে এসেও কিন্তু মেয়েরা লেখালেখি করেছেন যারা বিভিন্ন পেশা গ্রহন করেছিলেন ও যারা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। যেমন- মনিকুণ্ডলা সেনের 'সেদিনের কথা', পূন্যলতা সেনের 'ছেলেবেলার দিনগুলি', শান্তিসুধা ঘোষের 'জীবনের রঙ্গমঞ্চে', বীনা দাশের 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার', রেবা রায়চৌধুরী 'জীবনের টানে শিল্পের টানে'। যারা জেলে গিয়েছিলেন তাঁরা জেল জীবনের কথা লিখেছেন- রানী চন্দ-র 'জেনানা ফাটক'।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' হল প্রথম ভারতীয় নারীর আত্মজীবনী। এটি আমাদের উনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, আর বিংশ শতকের নারীদের লেখা আত্মজীবনীর মধ্যে অন্যতম হল সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' (১৯৩২)। সুদক্ষিণা সেন ছিলেন উনবিংশ শতকে একজন শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা, প্রগতিশীল বঙ্গনারী। এই আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে সুদক্ষিণা সেন তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক প্রেক্ষাপট, ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত সহ তৎকালীন সমাজে একাধিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা কিভাবে বঙ্গদেশের সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল- এই বিষয়টি আমি সবিস্তারে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

উনবিংশ শতকের বঙ্গসমাজ ও সুদক্ষিণার জীবন:

অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের সোহাগদল গ্রামে, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর সুদক্ষিণা সেন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় আর মাতা ছিলেন নিত্যকালী

গঙ্গোপাধ্যায়। সুদক্ষিণারা তিন ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন গোবিন্দবন্ধু আর ভগ্নী ছিলেন বগলা সুন্দরী।

উনবিংশ শতকে বঙ্গীয় সমাজ ছিল রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। নারীরা ছিল অবহেলিত ও অন্তঃপুরবাসিনী। সুদক্ষিণার পিতা জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গদেশে ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের থেকেও তার মধ্যে একটা যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী স্বাধীন চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটে। শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধ করে তিনি বলেছিলেন, "কন্যাদের লেখাপড়া শিখাইও ও বড় করিয়া বিবাহ দাও।"[২] কিন্তু উনবিংশ শতকের গোঁড়া রক্ষণশীল ও অন্ধকারচ্ছন্ন বঙ্গসমাজ মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে গ্রামে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিল। কেউ কেউ অর্বাচীনের মতো বলতে লাগলো, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হইবে।

উনবিংশ শতক ছিল বাংলার ইতিহাসে এক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তরের যুগ। শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম আন্দোলন, নারী শিক্ষার সূচনা, ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এই সময় বাংলার নারীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারাও প্রবলভাবে বজায় ছিল। এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ব্রত ও ব্রতকথা। বাংলার গ্রামীণ নারীরা এই শতকে ধর্ম, সংসার, প্রকৃতি ও নারীত্বকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্রত পালন করতেন। সুদক্ষিণাও বাল্যকালে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রত- যেমন মাঘমন্ডল, যম-পুকুর, মঙ্গল চন্ডী ইত্যাদি পালন করতেন। মাঘ মন্ডল ব্রতে সম্পূর্ণ মাঘ মাস প্রতি দিবস অতি প্রত্যুষে উঠে পুস্করিনীর ধারে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়তে হতো;

"উঠ উঠ, সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি মোরা হিয়ণের লাগিয়া...
যা,যা, নাইকানী, তুই আমার সই,
মাঘমন্ডলের ব্রত করতে ঘাট পাবো কই ?"[৩]

বাল্যকালে আরও একটি ব্রতর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার নাম যম-পুকুর। এই ব্রতের উদ্দেশ্য যমরাজার মাকে তুষ্ট করা এবং পরলোকগত গুরুজনদের জলদান করা। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সকল ব্রতকর্মে তার আস্থা চলে গিয়েছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ব্রত আর করিবেন না। তিনি বলেন যে,

> "পৌত্তলিকতায় যখন আমার বিশ্বাস নেই নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্কুর দয়াময় ঈশ্বরই যখন আমার শিশুমনে বপন করিয়াছেন তখন মিথ্যা অভিনয়ের প্রয়োজন কি!"[৪]

মেয়েদের সে সময়কার সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বালিকার এই ছোট বিদ্রোহ নেহাত ছোট নয়।

বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজে বাল্যবিবাহের ন্যায় কুপ্রথা বন্ধের জন্য তারা অপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। সুদক্ষিণার দাদার বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখন তার কাকারা একটি বংশজের (অর্থাৎ অকুলীন) কন্যার সাথে দাদার বিবাহ দিয়ে দেন। ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় তার 'বাল্যবিবাহের দোষ'[৫] নামক প্রবন্ধে; তিনি যুক্তি, শাস্ত্র, এবং বাস্তব সমাজচিত্রের আলোকে বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। সেই সময় 'বাল্যবিবাহ' নামক একখানি সংবাদপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। সেই সংবাদপত্রে সাধারণ জনগণকে বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে সচেতন করার জন্য বেশ কিছু প্রবাদ ও ছড়া প্রকাশিত হতো-

"অল্প বয়সে বিবাহ
সিংহ হয় বরাহ"-

ও

“অল্প বয়সে বিয়ে করা
কাঁচা বাঁশি ঘুণ ধরা”[৬]

সুদক্ষিণার দাদামহাশয় সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতি উদার। অনেক বিষয়ে তিনি দেশের প্রচলিত কুসংস্কার হইতে দূরে থাকতেন-

> “সে’কালে বিধবাদের নিজ্জলা একাদশী করিবার নিয়ম ছিল। এই কুসংস্কারটি লোকের মনে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, একাদশীর দিন কোন বিধবার মৃত্যু হইলেও একবিন্দু জল দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ভিজাইতে পারিতেন না। এমন কি একাদশীর দিনে মৃতা হতভাগিনী বিধবার চিতা ভস্মও ধুইবার নিয়ম ছিল না। এই নিদারুণ মূঢ়তার ফলে কত বিধবাকে যে শুষ্ককণ্ঠে মরিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়রে কুসংস্কার! পুরুষগণ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, এমনকি যাহা খুসি তাহাই করিতে পারিবে; কিন্তু হতভাগিনী বিধবা শুষ্ককণ্ঠে জল পাওয়া দূরে থাকুক, চিতাভস্মটুকু ধৌত করিলেও তাহার ধর্ম নষ্ট হইবে?”[৭]

সমাজ-সংস্কৃতি, ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নারীর আত্মপরিচয়ের নির্মাণ:

এইরূপ উদার ধার্মিক প্রকৃতি পিতার কন্যা বলেই, সুদক্ষিণার মা ঘোর কুসংস্কারের আবরণ ভেদ করে ব্রাহ্ম ধর্মের আলোকে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদক্ষিণার মা কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের ‘তত্ত্ববোধনী’[৮] ও ‘অবলাবান্ধব’[৯] নামক পত্রিকা পাঠ করে তাঁর হৃদয় বাহ্ম সমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ইতিহাসবিদ Geraldine Forbes তাঁর বই *Women in Modern India* উনিশ শতকের নারীজাগরণ ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের আলোচনা করতে গিয়ে ‘অবলাবান্ধব’ পত্রিকা-এর মতো সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।[১০] হিন্দু সমাজে তৎকালীন বিভিন্ন কুসংস্কার পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর মনে বীতরাগ উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দু সমাজ ছিল তাদের কাছে কারাগার স্বরূপ, তাই ব্রাহ্মসমাজে আসা সুদক্ষিণারা মায়ের কাছে, অন্ধকার কারাগার হইতে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে বাঁচার মতো একটা আশা।

উনবিংশ শতকে বাঙালি ভদ্র মহিলাদের দিন কাটতো অন্তঃপুরে। সেই সময় বাড়ির বাইরে মেয়েদের বের হওয়া বাঙালির সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হতো। উনবিংশ শতাব্দীতে অন্তঃপুরই ছিল মেয়েদের বিচক্ষণের সীমানা। সেই সময় কোন একটি উপলক্ষ নাহলে বাড়ি থেকে মেয়েদের বাইরে বেরোনো যেত না। এইজন্য সুদক্ষিণার মা গঙ্গাস্থানের অভিলাষে, এবং অন্তরে অন্তরে নিরাকার ব্রহ্মের আহ্বানে কলকাতা যাত্রার পথ বেছে নেয়।

অবশেষে গ্রামের একটা ছোট নৌকোতে নদীপথে কলকাতা যাত্রা স্থির হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের, নভেম্বর মাসে। সুদক্ষিণা সহ তিন ভ্রাতা-ভগ্নি, দাদার স্ত্রী, তাঁর মা, সোনাদিদি এবং মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় অভিভাবক স্বরূপ তাদের সঙ্গে যান। “যথাসময়ে, শুভক্ষণে বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন এবং বিষয়পত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া ভগবানের ডাকে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। শিশুগুলিকে কিরূপে পালন করিবেন, অর্থ কোথা হইতে আসিবে- এ সকল ভাবনা মাতৃদেবীর মনে তখন কিছুই আসিল না।”[১১]

অবশেষে দীর্ঘ ৭ দিন নানা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার সময় তাঁরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে যান। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখেন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় বেদীতে উপবিষ্ট। তাহার মুখমন্ডল হইতে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। অন্যদিকে

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সুমধুর সংগীত এবং অর্গান বাদনের দ্বারা সকলেই এক স্বর্গীয় অনুভূতি পায়। তিনি উপলব্ধি করেন,

> “হে ঈশ্বর সকল কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া সকল মাটির কল্পিত পুতুল দেবতাগুলি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তোমার নিরাকার রূপে মুগ্ধ ও বিমোহিত করিতে তুমি কোথায় আনিলে? এ আনন্দ যে প্রাণে ধরে না! এ সুখ কোথায় রাখিব? হে দয়াময়! তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।”[১২]

সুদক্ষিণা ও তাঁর পরিবার প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজে যেতেন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণ করতেন। ব্রাহ্ম সংগীত শুনতে ও গাইতে সুদক্ষিণা ও তার মা খুব ভালোবাসতেন। অভয়বাবু নামে এক ব্যক্তি এই নগর সংকীর্তনটি উচ্চস্বরে গাইতে শিখিয়েছিলেন।

> “আজি গাও গভীর স্বরে
> প্রেম ভরে নগরে-
> মধুর ব্রহ্মনাম,”[১৩]

শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্রাহ্ম উপাসনা নয়, কলকাতায় এসে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে হবে সেটা সকলেরই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় ব্রাহ্ম ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে নবাগত মহিলাদের জন্য একটা স্কুল স্থাপন করতে হবে। তাই স্থির হয় লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে ক্লাস হবে। কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি এক ঘন্টা করে স্কুলে পড়ানোর ভার গ্রহন করেন। এনাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়, দ্বারকনাথ গাঙ্গুলী, অম্বিকাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়।

কলকাতায় এইসময় একটা ছাপাখানা ছিল এখান থেকে প্রখ্যাত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *The Indian Mirror*[১৪] পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকা থেকেই সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যবস্থার (বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শ, কার্যকলাপ ও ধর্মীয় সংস্কারের) একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

কলকাতার এই ভারতাশ্রমে প্রতিদিন দু’ই বেলা উপাসনা ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা হতো। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রত্যাহ স্নানান্তে উপাসনা করতেন ভারতাশ্রমে আসতেন। তিনি হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুক্তি, নৈতিকতা এবং একেশ্বরবাদ এর উপর ভিত্তি করে উপদেশ প্রচার করতেন। কেশবচন্দ্র তাঁর এই উপাসনা পদ্ধতি সংকলন করে ‘Brahmo Upasana’ নামক একটা গ্রন্থ প্রকাশ করেন এতে প্রার্থনা, স্ত্রোত্র, উপদেশ এবং উপাসনার নির্দেশাবলি সংকলিত ছিল। সুদক্ষিণা তাঁর আত্মজীবনীতে দেখিয়েছেন একদিন ভারতাশ্রমে সমস্ত রাত্রি উপাসনা করা হয়। সন্ধ্যার সময় সকলে উপাসনায় বসলেন এবং পরের দিন প্রাতঃকালে সেই গভীর উপাসনার সমাপ্ত হয়। প্রত্যুষে প্রখ্যাত ব্রাহ্ম উপাসক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় সুমধুর কন্ঠে গেয়ে ওঠেন-

> “এবে জাগ সকলে অমৃতের অধিকারী”[১৫]

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের সুদক্ষিণা কলকাতার ব্রাহ্ম উপাসনা কেন্দ্র থেকে ঢাকায় আসেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঢাকাতে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অনুকরণে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে সুদক্ষিণার মা, তার পুত্র, পুত্রবধূ ও ছোট কন্যা সহ সেখানে ব্রাহ্ম উপাসনা ও বসবাস করছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকায় তাদের সেই আশ্রমে জালাল মিঙা নামক একজন মুসলমান ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুদক্ষিণা ও তার ভাই-বোনেরা তাকে ‘মিঙামামা’ ও তাঁর স্ত্রী প্যারী বিবিকে ‘মিঙামামী’

বলে ডাকতেন। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কিভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজকে এক বন্ধনের সূত্রে আবদ্ধ করে তুলেছিল তা সুদক্ষিণা তার আত্মজীবনীর মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন।

ঢাকার এই আশ্রমে থাকাকালীন সুদক্ষিণা সহ অন্যান্য নারীদের উপাসনার পাশাপাশি সকলের জন্য রান্না করতে হতো। তিনি দেখিয়েছেন,

> "আমরা রান্না করিতে করিতে পড়া শিখিতাম। বইগুলি একটি পিঁড়ির উপর রাখিয়া, ডাল কিম্বা ভাত চড়াইয়া দিয়া পড়া করিতাম। মধ্যে মধ্যে বইয়ের পাতাগুলি খুলিয়া রাখিয়া দিতাম। যে সময় বই হাতে লইয়া পড়িবার সুবিধা হইত না, অর্থাৎ হলুদ ইত্যাদি মাখাইতে হইত, সেই সময় খোলা পাতা দেখিয়া পড়া মুখস্ত করিতাম।"[১৬]

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষার যে চিত্র তা ফুটে উঠেছে তার এই মন্তব্য থেকে।

বিবাহ, পরিবার ও লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কাঠামো:

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজ ছিল ধর্মাশ্রয়ী, পুরুষতান্ত্রিক ও সামাজিকভাবে রক্ষণশীল। এই সময় নারীদের বিয়ে হতো অত্যন্ত অল্প বয়সে তাদের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য কিছুই ছিল না। বিবাহ নারীর জীবনে ছিল একমাত্র গন্তব্য। সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু নারী আত্মজীবনীকার, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিকগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। সুদক্ষিণা তার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন,

> "আমি পড়াশোনা করিতে বড়ই ভালোবাসিতাম। স্কুলে মনোযোগ সহকারে পড়িতে আমি বড়ই আনন্দ পাইতাম কিন্তু ভাগ্যদেবতা আমার কপালে 'পড়াশোনা' বোধহয় লেখেন নাই।"[১৭]

বাংলার প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবী লিখেছেন, তিনি যখন বারো বছর বয়সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থার বর্ণনা করেছেন,

> "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"[১৮]

এই বক্তব্য থেকে উনবিংশ শতকে বাল্যবিবাহের নির্মম বাস্তবতা ও কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজের অবজ্ঞা ও অবহেলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন সুদক্ষিণা ও অম্বিকাচরণ সেনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। পরের দিন শ্বশুরালয়ে, দলে দলে লোক নববধূকে দেখতে আসে এবং তাদের কেউ কেউ বললেন, "ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে না জানি কেমন? অদ্ভুত কিছু হইবে বোধ হয়।"[১৯] সেই সময় গ্রাম বাংলার নিয়ম ছিল যে, বাড়ির নববধূ ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবে কেউ তাকে দেখতে এলে মুখের ঘোমটা তুলে নববধূ মুখ দেখাবে, সেই সময় নববধূ চোখ বুঝে থাকবে। কিন্তু তারা দেখে এই শিক্ষিতা ব্রাহ্ম বধূর তো মুখ ঢাকা নেই, যে আসছে সেই তার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এছাড়া বয়স্কা বধূ, ব্রাহ্মণ কন্যা, বৈদ্য বর, এই সমস্ত কিছুই গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের চোখে খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কন্যা সন্তান এর কামনা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু শিক্ষা বিস্তার, ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার, নারী চেতনার জাগরণ কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজের মনোভাব পরিবর্তন করে তোলে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ ই অক্টোবর সুদক্ষিণার কন্যা সরযূবালার জন্ম হয় তিনি বলেছেন,

"আমার স্বামী কন্যাই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন।"[২০]

সুদক্ষিণা ও তার স্বামী দুজনেই ছিলেন শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী মানুষ। তাই তারা তাঁদের কন্যাকে বাল্যকাল থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি গান, বাজনা, সেলাই, প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের কন্যা সরযূবালাকে কলকাতার প্রথম মহিলা বিদ্যালয় 'বেথুন স্কুলে' ভর্তি করে দেন।

স্মৃতি, আত্মপরিচয় ও অন্তঃপুর জীবনের সীমানা অতিক্রম:

কিছুদিন পর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে জুলাই সরকার থেকে নির্দেশ আসে যে তার স্বামীকে কটকে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যেতে হবে। তখন কটকে রেলওয়ে ছিল না তাই যাতায়াত ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রী কন্যাকে কলকাতায় রেখে কটকে যাত্রা করেন। কলকাতায় কিছুদিন থাকার পর সুদক্ষিণা স্বামীর কাছে কটক যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সময় নারীরা বেশিরভাগ সময় যেহেতু অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকতো তাই সুদক্ষিণা তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "সমুদ্র কখনও দেখি নাই। কেবলমাত্র ভূগোল পুস্তকে সমুদ্র, পর্ব্বতের বিষয়ে পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত নূতন দেশ নূতন জিনিষ দেখিবার স্পৃহা আমার অত্যন্ত প্রবল।"[২১] কটক যাত্রাপথে স্টিমারে বসে, তিনি তার ফেলে আসা অতীতের স্মৃতির ক্যানভাসে একটি কবিতা লিখেছিলেন-

"কে তোরা দাঁড়ায়ে ঐ উচ্চ করি' শির,
অহঙ্কারে স্ফীত কেন সবার মূরতি?...
যাহাতে সাজিবে বৃক্ষ নয়নরঞ্জন; ছায়ায়
তাহার, জগতের সর্ব্বক্লান্তি হবে অপনিত।"[২২]

কটকে যাবার পর বিভিন্ন লৌকিক উৎসবের মধ্যে অন্যতম মেয়েদের উৎসবটি তাদের বাড়িতেই হতো। কটক এই উৎসবকে 'নারী উৎসব' বলা হতো। সেই নারী উৎসবের দিন পুরুষরাও নিমন্ত্রিত হতেন ও উপাসনায় যোগ দিতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, "সেই উৎসবের দিনটি যে কিরূপ আনন্দে কাটিত তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া ওঠে।"[২৩]

জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিবেশী দুই এক ঘর খ্রিস্টানো সেই নারী উৎসবের আনন্দের শামিল হতেন উৎসব আরাম্ভের পূর্বেই সমস্ত রান্নার কাজ করে রাখা হতো সেই খ্রিস্টান মহিলারাও তাকে অনেক সাহায্য করতেন। সেই উৎসবের দিন সুদক্ষিণা একটি স্বরচিত গান গেয়েছিলেন-

"আজি সম্বৎসর পরে মিলিনু ভগিনী সকলে
পূজিব মায়ের পদ ভক্তিভরে প্রাণভরে...
প্রেমসুধা হাতে ল'য়ে মা ডাকেন কাতর হয়ে
খাওয়াইতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধায় কাতর নারী-নরে।"[২৪]

সুদক্ষিণা স্বামী অম্বিকাচরণ সেনকে গভর্মেন্ট রাজশাহীতে বদলি করে দেন। রাজশাহীতে থাকার তার স্বামীর শারীরিক কিছু অসুস্থতা দেখা দেয় এবং স্বাস্থ্য সংকট ঘটে। হঠাৎ একদিন তার অসুস্থতার বিষয় জানিয়ে তিনি তার স্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন, আমি অবসর গ্রহণ করিয়া শীঘ্র কলিকাতা যাইতেছি, তোমাদের আসিবার প্রয়োজন নেই।

শারীরিক অসুস্থতার সত্বেও রাজশাহীতে তার স্বামীই ব্রাহ্মমন্দিরে আচার্যের কার্য সম্পাদনা করতেন। একদিন তার স্বামী সুদক্ষিণা কে নিয়ে ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়েছিলেন। সেই সময় সুগায়ক ও কবি রজনীকান্ত সেন

মহাশয় গান করছিলেন। তার সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব সংগীতে সেই দিন উপাসনা কিভাবে প্রাণবন্ত ও আবেগময় হয়ে উঠেছিল তা তিনি তার আত্মজীবনীতে সেই স্মৃতি তুলে ধরেছেন।

স্বামীর অবসর গ্রহণের পর তারা সকলে কলকাতায় আসেন। ইতিপূর্বেই, আমরা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি সুদক্ষিণা ও তার স্বামীর যে অনুরাগ তা দেখেছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এর প্রতি স্বামীর ভক্তি চিরদিন অটুট ছিল, তিনি তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশব চন্দ্র সেন এর নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি কোন পক্ষেই যোগদান করেননি। বস্তুতঃ সাধারণ ব্রহ্মসমাজ (১৮৭৮) ও নববিধান ব্রহ্মসমাজ (১৮৮০) দুই ব্রাহ্মসমাজেরই প্রচারক ও বন্ধুদিগের তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করতেন।

ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র হিন্দু কুসংস্কারের বিরোধিতা, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা ও উপাসনা- বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত থাকতো না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আলোচনা হতো। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের লর্ড কার্জন হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশকে দ্বিখন্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার স্বামী অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় ও একাধিক ব্রাহ্ম নেতা এই বাংলা ভাগের বিরোধিতায় আন্দোলনে সামিল হয়।

সুদক্ষিনার স্বামীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে এগোতে থাকে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর তার স্বামী চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর দুঃখ-কষ্ট এক গভীর মানবিক অভিজ্ঞতা— যা হৃদয়ের গভীরতম জায়গা থেকে অনুভব করা যায়। সেই গভীর অনুভবের কথাই তিনি আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন,

> "হায়! স্বর্গ যাঁহাকে আকিঞ্চন করে, পৃথিবীর মানুষ কতদিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে? আমি সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমার সুখ-দুঃখ তাঁহার সহিত প্রস্থান করিল। আজ সেই সুদূরের পানে তাকাইয়া আছি, কবে তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হইব, কবে আমার সকল দুঃখের প্রকৃত অবসান হইবে।"[২৫]

অন্তিম পর্ব, জীবন দর্শন ও তাৎপর্য:

একজন মানুষ যখন জীবনসন্ধিক্ষণে পৌঁছায়, তখন সে অতীতের পথচলার দিকে ফিরে তাকায়- সফলতা, ব্যর্থতা, আনন্দ, বেদনা, প্রাপ্তি আর অপূর্ণতার সংমিশ্রণে গঠিত একটি বর্ণিল ক্যানভাসের দিকে। জীবনের উপান্তে এসে সুদক্ষিণা সেন দেখতে পেয়েছেন, "কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়, সীমা অন্তরেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।"[২৬] অর্থাৎ তিনি স্মৃতিচারণা করেছেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম আর কালের প্রবাহে ভাসতে ভাসতে কোথায় পৌঁছেছি। তার সেই প্রিয় জন্মভূমি সোহাগদল গ্রাম পদ্মাতীরে অবস্থিত। প্রকৃতিদেবী যেন সেখানে স্বয়ং বিরাজ করছেন। তার শোভা ও সৌন্দর্যের কথা তিনি বর্ণনা করিতে সক্ষম নন যারা পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নাই অথবা যারা পল্লীগ্রামে কখনো বাস করেন নাই তারা সেই সৌন্দর্যের মর্ম কিছুতেই অনুভব করতে পারবেন না বলে তিনি মনে করেন। ফেলে আসা স্মৃতির কল্পনা চক্ষে তিনি দেখেন প্রবল স্রোতে পদ্মা নদীর জল বয়ে যাচ্ছে অসীমের পথে, মাঝিরা নদীর স্রোতে নৌকো নিয়ে ভাটিয়ালি গান করতে করতে নৌকোয় দাঁড় বাইছে। তাদের জীবনে ভয় নেই তারা যেন এই মত্ত প্রকৃতির সন্তান- তখন স্মৃতি তরঙ্গে সুদক্ষিণা নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

পল্লীগ্রামে বর্ষার সময়ই নৌকোযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের সুবিধা হয় বলেই এই সময়ের জন্য অনেকেই অপেক্ষা করে থাকেন। বালিকা বধূরা তাদের শ্বশুরবাড়ির অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বর্ষাকালে

ছোট নৌকো করে তাদের বাপের বাড়ি আসতো পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনদের দেখতে ও কিছুদিনের জন্য মুক্ত বাতাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার জন্য। "বালিকা সুলভ খেলাধুলা করা যাহাদের স্বভাব তাহারা শ্বশুরগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় ছটফট করিয়া থাকে।"[২৭] অতীতে ফেলে আসা এই সকল স্মৃতিমধুর ঘটনাগুলি জীবনের উপান্তে এসে তাঁর মানসচক্ষে ফুটে উঠেছে।

তারপরে বিষাদের সুরে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "শোকের আগুনে দগ্ধ করে কি ভগবান আমার পরলোকের উপযুক্ত করিলেন! উর্দ্ধলোকে আমার প্রিয়জনেরা ঘর সাজাইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।... হে প্রেমসিন্ধু, তোমার একবিন্দু প্রেম যাহা তুমি দয়া করিয়া আমার প্রাণে দিয়াছ, আমি যেন সেই বিন্দুটুকু তোমার অনন্ত প্রেমের সিন্ধুতে ঢালিয়া দিতে পারি।"[২৮]

উনবিংশ শতকের বাংলায় নারী চিন্তা ও নারী মুক্তি বিষয়টি সাম্প্রতিককালে একটি বহুল চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি'- নারী আত্মজীবনী হিসেবে শুধু একজন নারীর ব্যক্তিগত জীবনগাথা নয়, বরং তা একটি যুগের সমাজ-সংস্কৃতি, নারীর অবস্থান, এবং তার আত্মসংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল। লেখিকা যে স্পষ্টতা ও সংবেদনশীলতায় নিজের কথা বলেছেন, তা নারীর অভিজ্ঞতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাঁধা-ধরা রীতির মধ্যে থেকেও তাঁর আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

সুদক্ষিণা আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' শুধু তার মৌলিক জীবনের কাহিনী নয়, এ হলো সেই সময়কার প্রত্যেক নারী জাতির এক প্রতিবাদী চেতনা। প্রাচীন ভারতে বিশেষত বৈদিক যুগে যেখানে আমরা গার্গী, লোপামুদ্রা, অপালার ন্যায় বিদুষী শিক্ষিত নারীদের কথা জানতে পারি যারা সেই সময় সমাজে এক বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। সেই নারীজাতিই পরবর্তীতে সামাজিক রক্ষণশীলতা, পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য, পরাধীনতার শিকলে বাঁধা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সেই নারীরা সামাজিক সমতার দাবিতে কখনো সচেতন বা অবচেতন ভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ওঠে। সুদক্ষিণার এই 'জীবনস্মৃতি' শুধুমাত্র জীবনের কিছু স্মৃতিমধুর ঘটনার বিবরণই নয়, তা একটা যুগের নারীদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর।

স্মৃতিকথা মাত্রেই ঐতিহাসিক দলিল, নারী আত্মজীবনী ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি বিকল্প ও মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। পুরুষ প্রধান ইতিহাসে যেখানে নারীর উপস্থিতি ছিল সীমিত এবং প্রান্তিক, সেখানে আত্মজীবনী নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্ম প্রভৃতির অনালোচিত দিকগুলোকে তুলে ধরেন। একজন নারী যখন নিজের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, তখন তা শুধু তাঁর আত্মপ্রকাশ নয়, বরং তাঁর সময়কালের ইতিহাসের একটি প্রতিচ্ছবিও হয়ে ওঠে, সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' হল উনবিংশ ও বিংশ শতকের এইরূপ এক ঐতিহাসিক দলিল।

তথ্যসূত্র:

১ Stanton, Domna C. The Female Autobiography: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century. University of Chicago Press, Chicago, 1987, p. 3

[২] সেন, সুদক্ষিণা। *জীবনস্মৃতি*। দে'জ পাবলিশিং এন্ড স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২২।

[৩] তদেব, পৃ. ২৫।

[৪] তদেব, পৃ. ২৮।

[৫] ১৮৫০ সালে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রকাশিত হয়।

[৬] তদেব, পৃ. ৪২।

[৭] তদেব, পৃ. ৪০।

[৮] তত্ত্ববোধিনী সভা-র উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকাটি মূলত ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল এবং উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[৯] 'অবলা বান্ধব' পত্রিকা উনিশ শতকের বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কারমূলক সাময়িক পত্রিকা। এটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ এবং নারীদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলে।

[১০] Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 23–28.

[১১] সুদক্ষিণা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

[১২] তদেব, পৃ. ৫২।

[১৩] তদেব, পৃ. ৫২।

[১৪] 'The Indian Mirror'- উনিশ শতকের বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি সাময়িক পত্রিকা। এটি প্রথমে ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় এবং পরে কেশবচন্দ্র সেন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে ব্রাহ্ম সমাজের ভাবধারা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[১৫] তদেব, পৃ. ৬১।

[১৬] তদেব, পৃ. ৭১।

[১৭] তদেব, পৃ. ৭২।

[১৮] রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, পৃ. ২০।

[১৯] সেন, সুদক্ষিণা। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫।

[২০] তদেব, পৃ. ৭৮।

[২১] তদেব, পৃ. ৯৬।

[২২] তদেব, পৃ. ৯৭।

[২৩] তদেব, পৃ. ৯৯।

[২৪] তদেব, পৃ. ৯৯।

[২৫] তদেব, পৃ. ১১৫।

[২৬] তদেব, পৃ. ১২০।

[২৭] তদেব, পৃ. ১২০।

[২৮] তদেব, পৃ. ১২১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. সেন, সুদক্ষিণা। জীবনস্মৃতি। দে'জ পাবলিশিং এন্ড স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়, কলকাতা, ২০০২।

২. চন্দ, পুলক। নারী বিশ্ব। গাঙচিল, কলকাতা, ২০০২।

৩. চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ। অন্দরে অন্তরেঃ উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা। স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৬।

৪. গুপ্ত, সুপর্না (সম্পা.)। ইতিহাসে নারী: শিক্ষা। পঃবঃ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০১।

৫. ঘোষ, বিজিত (সংকলন ও সম্পা.)। প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড। পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১।

৬. Karlekar, Malavika. *Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women*. Oxford University Press, New Delhi, 1991.

৭. Sarkar, Tanika. *Hindu Wife, Hindu Nation: Gender, Religion and the Prehistory of Indian Nationalism*. Permanent Black, New Delhi, 2001.